দেশ-বিদেশের বিচিত্র আলাপন-৩৩

খন্দকার জাহিদ হাসান

বিজয় দিবসের সাক্ষাতকার

[মহাকাল মহাশয়ের মতো এত দক্ষ সাক্ষাতকার গ্রহণকারী আর হতে পারে না। তাঁর চলাচলের রকম-সকম ছিল অভাবিত। স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সকলের দ্বারেই উক্ত বান্দা হাজির হয়ে পড়তেন।

২০১০ সালের ষোলোই ডিসেম্বর বাংলাদেশের চল্লিশতম মহান বিজয় দিবসের শুরুতে বাংলাদেশ সময় রাত ঠিক বারোটা এক মিনিটে এক-ই সাথে তড়িৎ গতিতে তিনি একাধিক জনের সাক্ষাতকার নিলেন। প্রথমেই যে সাক্ষাতকারটি বর্ণিত হচ্ছে, তা ছিল সিডনীবাসী জনৈক বাংলাদেশী অভিবাসীর সঙ্গে মহাকাল মহাশয়ের সাক্ষাতকার।]

মহাকালঃ সুপ্রভাত।

অভিবাসীঃ (ঘুমজড়ানো বিহ্বলকণ্ঠে) সু- -প্র-ভা-ত! আপনি-ই- - কে-এ- -?

মহাকালঃ আমি মহাকাল। তা আজ এত সকাল সকাল ঘুম হতে জেগে উঠলেন যে!

[অভিবাসী দেওয়াল-ঘড়িটার দিকে চকিতে একবার তাকাল। কাঁটায় কাঁটায় ভোর পাঁচটা বেজে এক মিনিট।]

অভিবাসীঃ না, রোজ ভোর পাঁচটাতেই আমার ঘুম ভাঙ্গে তো।

মহাকালঃ তাই নাকি? আমি ভেবেছিলাম বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সেই মহান বিজয় দিবসের স্মরণেই বুঝি আপনার আজ এত আগেভাগে গাত্রোত্থান। তাই দিবসের সূচনালগ্নেই আপনার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলতে চলে এলাম।

অভিবাসীঃ (হাই তুলতে তুলতে) ও, আজ বুঝি বিজয় দিবস? মনেই ছিল না। (এবার পুরোপুরি ধাতস্থ হওয়ার পর কণ্ঠে সামান্য ঝাঁঝ মিশিয়ে) তা বিজয় দিবসের সূচনালগ্ন ছিল তো পাঁচ ঘন্টা আগে সেই রাত বারোটা এক মিনিটে। আপনি এত লেট যে?

মহাকালঃ জ্বী না। বাংলাদেশে এইমাত্র রাত বারোটা এক মিনিট বাজল।

অভিবাসীঃ (শ্লেষাত্মক কণ্ঠে) ও, আপনি বুঝি কেবল বাংলাদেশের টাইম ফলো করেন?

মহাকালঃ আজ্ঞে না, আমি কোনো দেশের-ই সময় মেনে চলি না। আসলে 'সময়' বলে আমার অভিধানে কোনো শব্দই নেই। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত— এ-সব মানুষের বানানো। আমার কাছে এ সবকিছুই অবান্তর।

অভিবাসীঃ দেখুন, অতো তত্ত্বকথা শোনার মতো টাইম আমার হাতে নেই। আজ উইক এন্ড্ না— উইক ডে। রাইট ন্যাউ আমার হাতে অনেক কাজ। প্রথমেই বাথরুমের কাজ-কারবার কম্প্লিট করা দরকার। তারপর ট্রেড্মিলে চড়ে শরীরের ঘাম ছোটাতে হবে। এরপর একটু ইন্টারনেট না চষলেই নয়। অফিসের কম্পিউটারটা কাজ করছে না। বেশ কিছু ই-মেইল জমে যাওয়ার কথা। তা ছাড়া ফেস্বুক তো রয়েছেই। ফাইনালি ব্রেকফাস্ট সেরে অফিসে দৌড়াতে হবে।

মহাকালঃ সব-ই হবে। শুধু দু'দন্ডের জন্য একটু খোশগল্প সেরে নিচ্ছি— এই যা।

অভিবাসীঃ কি মুশ্‌কিল! বললাম তো হাতে টাইম নেই। আর তা ছাড়া আপনি তো আবার সাধু ভাষায় কথা বলেন। ওতে আমি ফ্যামিলিয়ার নই।

মহাকালঃ না, সাধু ভাষায় নয়। আমি শুদ্ধ বাংলা ভাষাতেই কথা বলছি।

অভিবাসীঃ ও-ই হলো। আপনার মোটিভ্ বুঝতে আর আমার বাকী নেই! ভিক্টরি ডে নিয়ে কথা বলবেন তো? (এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে) এক কাজ করুন। এই সিডনীতে অনেক ওয়ার্থলেস্ কবি-সাহিত্যিক আছে। আপনি বরং তাদের কারো সাথে মিট্ করেন। জমবে ভালো।

মহাকালঃ উহা লইয়া আপনাকে দুশ্চিন্তা করিতে হইবে না। কারণ উক্ত সাক্ষাতকার গ্রহনের কাজটিও আমি ইতিমধ্যেই শুরু করিয়া দিয়াছি।

অভিবাসীঃ (এক মুহূর্ত থম্‌কে থাকার পর রাগতঃ স্বরে) আমার সাথে ফাজলামি করা হচ্ছে? রাইট ন্যাউ তুমি তো আমাকে ইন্টারভিউ করছ।

মহাকালঃ তা কেন? কহিলাম না, আমার নিকট সময় অবান্তর?

অভিবাসীঃ (এবার তারঃস্বরে) এই গেলি, না কুত্তা ডাকুম?

মহাকালঃ তাহার আর আবশ্যক হইবে না। কারণ একটি শারমেয় আমার সম্মুখেই রহিয়াছে। (মুচ্‌কি হেসে) বুঝিলে হে, ইহাকেই সাধু ভাষা বলা হয়। (বাঁ চোখ টিপে) আচ্ছা চলি। (উড়ন্ত অবস্থায় প্রস্থান করতে করতে) বি-দা-য়-।

অভিবাসীঃ (মহাকাল মহাশয়কে ধাওয়া করতে করতে) এই রাস্কেল! আমার এত টাইম ওয়েস্ট্ করলি, আর আমাকে একটা থ্যাংক্‌স্ জানালি না?

মহাকালঃ (অভিবাসীর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে) ওহে শ্যালকের পুত্র শ্যালক, ধন্যবাদ তোর প্রাপ্য নহে। কারণ তুই দুর্বিনীত। তাহা ছাড়া তোর এক মুহূর্ত সময়ও আমি অপচয় করি নাই।

অভিবাসীঃ তার মানে?

[দূর থেকে মহাকাল মহাশয়ের প্রতিধ্বনিত কণ্ঠঃস্বর ভেসে আসে।]

মহাকালঃ তুই কি অন্ধ? ঘড়ির পানে একটিবার চাহিয়া দ্যাখ্।

[মহাকাল মহাশয় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। অভিবাসী কয়েক মুহূর্তের জন্য থম্‌কে দাঁড়িয়ে থাকার পর আবার আগের জায়গাতে ফিরে এল। তারপর দেওয়াল-ঘড়ির দিকে আর একবার ফিরে তাকাল। তাতে সে আরও বিমূঢ় হয়ে পড়ল। ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় ভোর পাঁচটা বেজে এক মিনিট! ঠিক এই সময়েই সে ঘুম থেকে জাগে। তার মাথাটা এলোমেলো হয়ে গেল। এ-সব হচ্ছেটা কি! সে কি পাগল হয়ে যাচ্ছে?

ওদিকে সিডনীবাসী জনৈক বাংলাভাষী ছড়াকারের সাথে মহাকালের আর একটি সাক্ষাতকার চলছিল।]

মহাকালঃ সুপ্রভাত। আমাকে চিনতে পারছেন?

ছড়াকারঃ আরে, কি সৌভাগ্য! আসুন, আসুন। সুপ্রভাত। আপনাকে চিনব না কেন! প্রায়-ই তো আপনার সঙ্গে দেখা হয়। আর তা ছাড়া মাঝে মাঝেই আমি আপনার কথা ভাবি।

মহাকালঃ বাহ্! শুনে বড় খুশী হলাম। তা হলে বেশ সকাল সকাল উঠে পড়েছেন !

ছড়াকারঃ তা উঠতে তো হবেই। বিজয় দিবস বলে কথা! (হঠাৎ গলা খাদে নামিয়ে নিয়ে) আর তা ছাড়া আজ আমার স্ত্রীর জন্মদিন।

মহাকালঃ তাই নাকি? কি আনন্দের কথা! ঠিক একাত্তরের এই দিনটিতেই আপনার স্ত্রী জন্মগ্রহন করেছিলেন বুঝি?

ছড়াকারঃ না, ঠিক তা নয়। তারিখটা এক-ই হলেও একাত্তরের বেশ ক'বছর আগেই তার জন্ম।

মহাকালঃ তা বেশ বেশ। উনাকে আমার তরফ থেকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাবেন। সেই সাথে আপনাদের দু'জনের জন্য রইল বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা।

ছড়াকারঃ ধন্যবাদ। তো এখন বলুন আপনার জন্য কি করতে পারি!

মহাকালঃ না, কিছু করার দরকার নেই। শুধু বলুন এই বিশেষ দিনটিতে আপনার অনুভূতির কথা।

ছড়াকারঃ এ অনুভূতি তো মহানন্দের। স্বাধীনতা বলে কথা। বিজয় বলে কথা। দেখতে দেখতে ঊনচল্লিশটা বছর কেটে গেল। (স্মৃতিতাড়িত উদাস কণ্ঠে) আমি তখন ছোটো। কিন্তু আজও স্পষ্ট মনে আছে, বিজয়ের আনন্দে আমাদের পাড়ার বেশ কিছু ছেলেমেয়ের সাথে আমিও পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম।

মহাকালঃ বিজয়ের আনন্দে পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন?

ছড়াকারঃ হ্যাঁ, আপনি তো সব-ই জানেন। শুধু শুধু হেঁয়ালী করেন।

মহাকালঃ হেঁয়ালীতেও তো এক ধরণের আনন্দ রয়েছে। তাই না?

ছড়াকারঃ তা তো বটেই। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। একটা কিছু করতে হবে তো! মফঃস্বল শহর। হাতের কাছে করার মতন তেমন কিছু ছিলও না। তখন পৌষ মাসের শুরু। পুকুরের জল বেশ ঠান্ডা। তাতে কি! পাক্কা তিন তিনটে ঘন্টা আমরা সেই ঠান্ডা জলে ঝাঁপালাম।

মহাকালঃ তারপর সবাই জ্বরে পড়লেন বুঝি?

ছড়াকারঃ তা পড়ব কেন? বিজয়ের আনন্দ। এ কি সোজা কথা! আপনি তো সব-ই জানেন, সবই বোঝেন। মহাজ্ঞানী মহাকাল! দুনিয়ার কতো সব ঘটনার স্বাক্ষী। আপনাকে আর কি বোঝাব?

মহাকালঃ সে যাক। এখন বলুন, এই প্রবাস জীবনে ঊনচল্লিশ বছর বাদে আপনার কেমন লাগছে।

ছড়াকারঃ (ছোট্টো একটা নিঃশ্বাস ফেলে) দূ-ঊ-ঊ-র! সিডনীর মাটিতে ঊনচল্লিশ বছর পর বাংলাদেশের বিজয় দিবস! কেমন আবার লাগবে!

মহাকালঃ আপনাকে কিছু বিমর্ষ দেখাচ্ছে। কিছু হয়েছে কি?

ছড়াকারঃ না, তেমন কিছু নয়।... ইয়ে, জানেন, ক'দিন আগে আমার এক বন্ধু আমাকে এক প্রস্তাব দিল।

মহাকালঃ কি প্রস্তাব?

ছড়াকারঃ বলল, চলো আমরা একটা 'বিদিউস' নামের সংগঠন খুলি।

মহাকালঃ 'বিদিউস' মানে?

ছড়াকারঃ 'বিশেষ দিবস উদযাপন সমিতি'। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, বিদিউস বানানোর উদ্দেশ্যটা কি হবে? সে বলল, এই ধরো, আমাদের যে-সব জাতীয় দিবস-টিবস রয়েছে, যেমনঃ স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারী— এগুলো আমরা ঘটা করে পালন করব। আমি বললাম, ও-সব করার জন্য সংগঠনের তো আর অভাব নেই। তার জন্য আবার নতুন সংগঠন খোলার দরকারটা কি?

মহাকালঃ তারপর?

ছড়াকারঃ তারপর আর কি! বিদিউস খোলার ব্যাপারে আমি রাজী না হওয়াতে সেই ব্যাটা বন্ধু আমার সংগে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, আমাকে বাদ দিয়েই নাকি তারা মাত্র তিনজন মিলে একটা সংগঠন দাঁড় করে ফেলেছে। তাই তো মনটা বেশ খারাপ।

মহাকালঃ ও নিয়ে মন খারাপ করার কি আছে? যার যা ইচ্ছে, সে তা করুক না! ক্ষতি তো নেই।

ছড়াকারঃ ক্ষতি নেই? আপনি মহাজ্ঞানী হয়ে এ কথা বলতে পারলেন? একে তো এখানে হাজার হাজার সংগঠন। তার ওপর নতুন করে আরও সংগঠন খোলার কোনো মানে হয়? যত্তোসব!

মহাকালঃ দেখুন, আবারও বলছি, ক্ষতি নেই। কারণ মানব সভ্যতার এই যে বিশাল মহীরুহ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে বিশালতর হয়ে চলেছে, এর মধ্যে অনির্বচনীয় এক মহত্ত্ব রয়েছে, সৌন্দর্য রয়েছে। কোনো কিছুই অর্থহীন নয়। আমি মহাকাল এই মুহূর্তে আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছিঃ এই বিশাল মহীরুহের অপ্রয়োজনীয় সকল ডালপালা ছাঁটা হয়ে যাবে। রইবে শুধু এর একান্ত আবশ্যকীয় অংশসমূহ।

[ছড়াকার মুগ্ধ-বিস্ময়ে মহাজ্ঞানী মহাকালের কথা শুনতে থাকে। সামান্য বিরতির পর মহাকাল আবার মুখ খোলেন।]

মহাকালঃ শুধুমাত্র মানব-সভ্যতা নয়, এই বিশ্ব-চরাচরের মহাবিশাল পরিধি জুড়ে যে ঘটনাপুঞ্জ একের পর এক আবির্ভূত হয়ে চলেছে, তার সব-ই মহান। তবে যা কিছু কীর্তিমান, যা কিছু ভাস্বর, শুধু তা-ই চিরকালের জন্য রয়ে যাবে। আর বাকীটুকু ঝরে পড়বে। তাই আপনাকে বলছিলাম, মন খারাপের কিছু নেই। বিজয় দিবসের প্রাক্কালে হাসিতে ভরে উঠুন, সবাই আনন্দ করুন। আবার দেখা হবে। শুভ বিদায়!

ছড়াকারঃ (অস্ফুট বিহ্বল কণ্ঠে) আবার দেখা হবে। বি-দা-য়!!!

[যুগপৎভাবে এক-ই সময়ে ঢাকার উত্তরাতে বসবাসকারী এক ধনী পরিবারের বাসায় বারো বছর বয়সী ফুটফুটে এক কিশোরী জুলেখার সঙ্গেও তার পড়ার ঘরে কথা বলছিলেন শ্রীমান মহাকাল। রাত তখন ঠিক বারোটা বেজে এক মিনিট।]

জুলেখাঃ আপনাকে দেখেই আমি চিনতে পেরেছি। আপনি মহাকাল না?

মহাকালঃ হ্যাঁ। কি করে চিনলে?

জুলেখাঃ আপনাকে চিনতে কারও কষ্ট হওয়ার কথা নয়। দেখলেই চেনা যায়। শুধু চেনার মতো চোখ থাকা চাই।

মহাকালঃ (দরদভরা গলাতে) বা-ব্বা! এতটুকুন মেয়ে তুমি, এত জ্ঞান তোমার?

জুলেখাঃ মোটেও না। আমি সামান্য এক মেয়ে। আমার সাথে আপনি কথা বলতে এসেছেন— এ তো আমার পরম সৌভাগ্য!

মহাকালঃ জুলেখা, তুমি খামোখা আমাকে লজ্জা দিচ্ছ। আমি মহাকাল হলেও এই বিশাল মহাবিশ্ব থেকে শুরু করে অতি তুচ্ছ ধুলিকণাও আমার কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। রাজাধিরাজ ও ভিখারী— উভয়ের মর্যাদাই আমার নিকট সমান। যা হোক, এখন বলোতো এত রাত জেগে তুমি কি করছিলে?

জুলেখাঃ কি আর করব! পড়াশোনা করছিলাম।

মহাকালঃ তাই বলে এত রাত জেগে?

জুলেখাঃ দেখুন, আমার মা একজন ভিখারিনী। রাস্তায় আমার জন্ম হয়েছিল। আমার বয়স যখন ছয় বছর, তখন আমার মা এই বাসার কাজের মেয়ে হিসাবে আমাকে রেখে চিরকালের জন্য হারিয়ে যান। কিন্তু তারপর এ বাড়ীর সবাই লেখাপড়ার প্রতি আমার দারুণ আগ্রহ দেখে আমাকে স্কুলে ভর্তি করে

দিল। আর বাসার কাজের জন্য অন্য লোক রাখল।... আপনার তো সব-ই জানার কথা।

মহাকালঃ হ্যাঁ, সব-ই জানি। তবু বলে যাও। তোমার নিজের মুখ থেকে শুনতে আমার বড় ভাল লাগছে।

জুলেখাঃ সেই জন্যই বলছিলাম কি, এখন আমাকে সেই লেখাপড়াটা খুব ভালমতন চালিয়ে যেতে হবে না? সবার কাছে আমার মুখটা রাখতে হবে না?

মহাকালঃ তা তো বটেই। তবে এটাও সত্য যে, পড়াশোনার প্রতি শুধুমাত্র তোমার আগ্রহের কারণেই এঁরা তোমার শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করেননি, তোমার সুন্দর ব্যবহার আর সুন্দর মুখও এর অন্যতম কারণ।

[জুলেখা সামান্য আরক্তিম হয়। তবে নিজেকে একটু সামলিয়ে নিয়েই মিষ্টি কণ্ঠে আবার তার কথার ঝর্ণা ঝরাতে শুরু করে।]

জুলেখাঃ হতে পারে। তবে আসল কথা হল, এই বাসার সবাই মানুষ হিসাবে খুব-ই ভাল।

মহাকালঃ আচ্ছা, এবার আমায় বলো, আজ যে বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস, সে কথাটি তোমার কি মনে আছে?

জুলেখাঃ হুঁ, আছে।

মহাকালঃ তোমার বয়স তো এখনও বেশ কম। তবু এ-ব্যাপারে তোমার কিছু অনুভূতির কথা শোনাবে কি?

জুলেখাঃ (ফোঁস্ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে) আমি দুঃখিত যে, এ-ব্যাপারে আমার তেমন কোনো অনুভূতি নেই।

মহাকালঃ সে কি কথা! তুমি অল্পবয়সী হলেও তোমার তো অনেক জ্ঞানবুদ্ধি। নিজ দেশ ও জাতির এমন একটা গৌরবময় দিনের ব্যাপারে তোমার কোনো অনুভূতি থাকবে না?

[জুলেখা দু'পাশে মৃদুভাবে তার মাথা নাড়াতে থাকে। তার দু'চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় জল নেমে আসে। অবশেষে সে আবার মুখ খোলে।]

জুলেখাঃ (ধরা গলায়) না থাকলে আমি কি করব? তার চেয়ে আপনাকে বরং অন্য কিছু বলি। (আঁচলে চোখ মুছে নিয়ে) আমার মায়ের কাছে শুনেছিলাম যে, তাঁর বাবা একজন গরীব মাঝি ছিলেন। একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে তিনি আর ফিরে আসেননি। আমার মা'র বয়স তখন মাত্র এক বছর। অভাবের তাড়নায় তাঁর মা অর্থাৎ আমার নানী তাঁর একমাত্র বুকের ধনকে নিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে কাজের ধর্না দিতে থাকেন। কিন্তু দেশে তখন আকাল থাকায় কোনো লাভ হয়নি। শেষে আমার নানী আমার মাকে নিয়ে ঢাকা শহরে চলে আসেন। তাঁর ডান হাত নুলো ছিল। তাই কোথাও তাঁর কোনো কাজ জোটেনি। তারপর তিনি পুরোপুরি ভিখারিনীর জীবন বেছে নিতে বাধ্য হন। একদিন নানী মতিঝিলে গাড়ী চাপা পড়ে মারা যান। মায়ের বয়স তখন সাত। (সামান্য বিরতির) তারপর আর কি! সেই থেকে আমার মা-ও পুরোপুরিভাবে রাস্তার মেয়ে হয়ে গেলেন। তাঁর কোনো ঘর ছিল না, বর ছিল না। সত্যিকারের কোনো বন্ধু-বান্ধবও ছিল না। যেখানেই রাত নামত, সেখানেই মা ঘুমাতেন। কখন আমি তাঁর পেটে এলাম, সে ব্যাপারেও তাঁর কোনো চেতনা ছিল না।... আমি জানি না, কে আমার বাবা। জানার

ব্যাপারে কখনো আমার কোনো আগ্রহও নেই। তবে এই বয়সে এসে এটুকু ধারণা করতে পারি যে, ঐ লোকটা ছিল কোনো ফূর্তিবাজ মানুষ।

[এই পর্যন্ত বলে জুলেখা থামে এবং হাঁফাতে থাকে। শারীরিক ক্লান্তির কারণে নয়, বরং মানসিক অবসাদবশতঃই মেয়েটা এ-রকম হাঁফাচ্ছিল। সে আর কোনো কথা বলে না। বেশ কিছুক্ষণ পর মহাকাল তাকে সান্ত্বনা দিতে থাকেন।]

মহাকালঃ আমি তোমার কষ্টটা বুঝি জুলেখা। এক বিশেষ পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তোমাদের পরিবার ছারখার হয়ে যায়। শুধু তোমাদের নয়, আরও অনেক পরিবারের-ই এ-রকম বেহাল অবস্থা হয়েছে। তবু আজ বলব যে, একটা দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ, বিজয়লাভ— এ সব খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অতীতের সব জ্বালা-যন্ত্রণার কথা ভুলে একমাত্র সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার আর কোনো বিকল্প নেই। তুমি খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে, এসব কথা নিশ্চয় তুমি জানো।

জুলেখাঃ হ্যাঁ, জানি। (হঠাৎ কথার মোড় ঘুরিয়ে) আচ্ছা, আপনি তো আরও অনেক নেতা ও নামকরা সব মানুষের সাথেও কথা বলেন। তাই না?

মহাকালঃ হ্যাঁ, বলি।

জুলেখাঃ আমার হয়ে কখনো তাদেরকে একটা অনুরোধ করবেন?

মহাকালঃ কি অনুরোধ?

জুলেখাঃ সেটা বলার আগে আপনাকে আর একটা জিনিস বলি। (স্মৃতিতাড়িত গাঢ় স্বরে) অনেকদিন আগে আমার মা একটা সব্জীওয়ালার কাছ থেকে বিরাট একটা চাল-কুমড়ো ভিক্ষা পেয়েছিলেন। আমার বয়স তখন বোধ হয় চারের মতো হবে। মা আর আমি অনেকদিন ধরে খুব তৃপ্তি করে ঐ কুমড়োটা খেয়েছিলাম। আমার এখনও মনে আছে, কুমড়োটার কয়েকটা বীচি মা রেল-সড়কের এক সেতুর নীচের খুব-ই গোপন একটা জায়াগাতে জলের ধারে পুঁতে দিয়েছিলেন। বেশ কিছুদিন পর মা আমাকে নিয়ে একদিন ওখানে গেলেন। আমরা দেখলাম যে, কি সুন্দর কয়েকটা চারা বেরিয়েছে। মাঝে মাঝেই ওখানে আমরা যেতাম। আমরা তখন কাছেই একটা বস্তির মতো জায়াগায় থাকতাম। আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে, চারাগুলো আস্তে আস্তে মাটির ওপরেই অনেক ডালপালা ছড়িয়েছিল, তারপর গন্ডায় গন্ডায় ফুল ছেড়েছিল। কি সুন্দর সুন্দর হল্‌দে রং-এর ফুল! (ফিস্‌ফিস্ শব্দে) ওটাই আমার জীবনে প্রথম দেখা সবচেয়ে সুন্দর কোনো জিনিস। লতাগাছটার পাতায় পাতায় ফুলে ফুলে কতো মায়া, কি সৌন্দর্য জড়িয়ে ছিল, (আবেগের আতিশয্যে হঠাৎ 'আপনি' থেকে 'তুমি'-তে নেমে এসে) তোমাকে তা আমি বোঝাতে পারব না। ঐ গাছের লতা, পাতা, ফুল— সব-ই মা আমাদের ভোগে লাগিয়েছিলেন। বেশী ফুল খেয়ে ফেলাতে কুমড়ো তেমন ফলেনি। যে ক'টা ফলেছিল, সেগুলোও ভেজা মাটিতে পড়ে থাকার কারণে পচে যাচ্ছিল। অবশ্য সামান্য কিছু কুমড়ো আমরা খেতে পেয়েছিলাম...

[জুলেখার গলা মিয়িয়ে আসতে থাকে। মহাকাল কথার মোড় ঘোরাতে চেষ্টা করেন।]

মহাকালঃ তোমার অনুরোধটা যেন কি?

জুলেখাঃ (স্বপ্নোত্থিত কণ্ঠে) কিসের অনুরোধ?

মহাকালঃ একটু আগেই তুমি বললে না যে, তোমার হয়ে আমি যেন দেশের হর্তাকর্তাদের কাছে একটা অনুরোধ রাখি?

জুলেখাঃ ও হ্যাঁ।... জানো, এই বাসাটার পেছনে একটা সুন্দর বাগান আছে। আমি প্রতি বছর ওখানে কুমড়ো গাছের চাষ করি। দিনের অনেকটা সময় ওখানে কাটাই। কুমড়ো গাছের লতাপাতা আর ফুলের সঙ্গে একা একা নিজের মনে কথা বলি। এ-বাসার মা আমাকে মাঝে মাঝেই সুর করে ডাকতে থাকেন, 'ও জুলি-ই-ই- -! সারাক্ষণ তুই ওখানে একা একা বসে কি করিস্‌রে?' (হঠাৎ সুর পাল্টিয়ে) আচ্ছা, কুমড়োফুলকে বাংলাদেশের জাতীয় ফুল করে দিলে কেমন হয়?

[মহাকাল মহাশয় বেশ বুঝতে পারলেন যে, মেয়েটা পুরোপুরি ঘোরের মধ্যে চলে গেছে। তবু তাঁকে কিছু তো বলতে হবে!]

মহাকালঃ কুমড়োফুল? হ্যাঁ, খারাপ কি!

জুলেখাঃ (উৎসাহের সাথে) আমিও তাই বলি। কি সুন্দর হল্‌দে রং-এর ফুল! দেখলেই দু'চোখ জুড়িয়ে যায়! তারপর যখন অনেক মৌমাছি আর ভ্রমরা এসে ওদের ওপর নেচে নেচে বেড়াতে শুরু করে, তখন না...

[জুলেখা হঠাৎ থেমে যায়। তারপর সে মহাকালের অশরীরি চোখের দিকে তাকায়। তারপর হঠাৎ যেন লজ্জা পেয়ে যায়। তার চোখেমুখে এক ধরণের বেদনাভরা হাসি খেলা করতে থাকে।]

জুলেখাঃ না, থাক। কাউকে কোনো অনুরোধ করতে হবে না।... ইয়ে, শাপলা ফুল-ই তো ভালো। কি সুন্দর পাঁপড়ি! সারা বাংলাদেশে জলের বুকে কেমন ভাসতে থাকে!!

মহাকালঃ জুলেখামণি, বললাম-ই তো, আমি তোমার সব কষ্ট বুঝি। কি আর করবে বলো! কিছু কিছু জিনিস আর পাল্টানো যায় না, পাল্টালে ব্যাপারটা শোভন দেখায় না।

জুলেখাঃ (কিছুটা কঠিন গলায়) আমি জানি। তোমার সঙ্গে এমনি একটু মজা করছিলাম।

[মহাজ্ঞানী মহাকাল হঠাৎ যেন থম্‌কে যান। তারপর তোত্‌লাতে থাকেন।]

মহাকালঃ ইয়ে, তা... তোমার পছন্দটা না... খুব সুন্দর।... যুক্তি আছে।

জুলেখাঃ জানো, আমি এখন ভালমতো খেতে-পরতে পাই। তবে এখনও আমার খিদের কষ্টের কথা খুব ভাল করে মনে আছে। আমি না প্রায়-ই ভাবি যে, বাংলাদেশের অনেক মানুষ খুব গরীব। এদেশের জাতীয় পশু হবে গরু বা ছাগল, যাদের দুধ-মাংশ খাওয়া যায়। জাতীয় পাখী হবে মুরগী। তা ছাড়া জাতীয় ফুল হিসাবে কুমড়োফুলের নাম ঘোষণা করা উচিত। কারণ এদেশের লক্ষ লক্ষ গরীব লোক কুমড়ো খেয়ে বাঁচে। তবে হ্যাঁ, জাতীয় ফল কাঁঠালের ব্যাপারটা ঠিক আছে। (আবারও মহাকালের চোখের দিকে তাকিয়ে) ইয়ে, তুমি আমাকে পাগল ভাবছ নাতো?

মহাকালঃ নাতো!

জুলেখাঃ আমি জানি যে, এ-সব জাতীয় ব্যাপার-স্যাপারের ঘোষণাতে কিচ্ছু যায় আসে না। আমি কেবল আমার মনের কথাটা বললাম। তুমি আর কাউকে এ-সব বোলো না, হ্যাঁ?

[মহাকাল জুলেখাকে কথা দিল, কাউকে সে বলবে না। মেয়েটার দু'চোখ ছলছল করছিল। তবে সে হাসছিল। আবার হাসার অভিনয়ও হতে পারে। মহাকাল মহাশয় তার মাথাতে হাত রেখে তাকে আশীর্বাদ করলেন। তারপর শুধু বললেন, 'আবার দেখা হবে। ভাল থেকো।']

কবি ও লেখক খন্দকার জাহিদ হাসান সিডনীবাসী একজন বাংলাদেশী, লিখনী: ১৩/১২/২০১০

লেখকের আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন